بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ০৫ জুন, ২০২৬ মোতাবেক ০৫ এহসান, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গত খুতবায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিনয় ও নম্রতার বিভিন্ন ঘটনা বা তাঁর (আ.) উপদেশমালা বর্ণনা করেছিলাম। আজও এ প্রসঙ্গে কিছু ঘটনা এবং তাঁর (আ.) বিভিন্ন উপদেশ উপস্থাপন করব।

হযরত শেখ মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উত্তম চরিত্রের মান এমন ছিল যে, কাদিয়ানের যে-সব মানুষ সর্বদা তাঁর (আ.) বিরুদ্ধে শত্রুতায় লেগে থাকত এবং বিরোধিতার কোনো সুযোগই হাতছাড়া করত না, তারাও যখন তাঁর (আ.) বাড়িতে আসত এবং কড়া নাড়ত, তখন আমি দেখেছি, তিনি (আ.) খালি পায়েই বাইরে আসতেন। আর দেখামাত্রই অত্যন্ত স্নেহ ও দয়ার সাথে তাদের সালামের উত্তর দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, 'আপনি ভালো আছেন তো?' এরপর তাদের বাড়ির সবার অবস্থা জিজ্ঞেস করে তিনি (আ.) বলতেন, 'কী মনে করে এসেছেন?' তারপর যখন সে ব্যক্তি তার প্রয়োজনের কথা বলত, তখন তিনি (আ.) জিজ্ঞেস করতেন, 'কতটুকু প্রয়োজন?' এরপর তিনি (আ.) তাদের প্রয়োজনের চেয়েও বেশি এনে দিতেন এবং বলতেন, 'যদি আরও প্রয়োজন পড়ে তাহলে আরও নিয়ে যাবেন।' শত্রুদের প্রতিও তাঁর (আ.) ব্যবহার ছিল অনেক উন্নত মানের এবং তাদের সাথেও তিনি (আ.) সর্বদা পরম বিনয়সুলভ ব্যবহার করতেন, কখনও অহংকার প্রদর্শন করেন নি।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি মুন্সী জাফর আহমদ সাহেবের (রা.) কাছ থেকে এই ঘটনাটি শুনেছেন এবং মৌলভী শের আলী সাহেব (রা.) তাকে বলেছিলেন, মীরাঁ বখশ প্রতিবন্ধী নামক মানসিকভাবে কিছুটা ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তি ছিল। একবার বড়ো মসজিদ থেকে আসার সময় সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নাম ধরে ডাক দেয়। [অর্থাৎ, চরম বেয়াদবির সাথে নাম ধরে ডাকে।] যাহোক, তার বুদ্ধি ছিল না তাই এভাবেই তার নাম নেবার কথা ছিল। সে বলতে থাকে, 'ওহে গোলাম আহমদ!' তিনি (আ.) তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, 'জি!' তিনি (আ.) কিছু মনে না করে বলেন, 'জি! কী বলতে চান?' সে বলে, 'সালাম তে আখ্যিয়া কার' অর্থাৎ, পাঞ্জাবী ভাষায় সে বলে, 'আগে সালাম তো করো!' সে বেচারা আপন মনে নিজেকে একজন অফিসার মনে করত। তিনি (আ.) বলেন, 'আসসালামু আলাইকুম।' তারপর সে বলে, 'মামলা পরিশোধ করো।' সেখানে জমিদারদের মধ্যে মামলা বা খাজনা প্রদান করা হতো, যা সরকারের পক্ষ থেকে একটি ট্যাক্স ছিল। যাহোক, হুযূর (আ.) তার কথা শুনে পকেট থেকে রুমাল বের করে তা থেকে চার আনা বা আট আনা তাকে দিয়ে দেন। সে খুশি হয়ে 'ঘোড়িয়াঁ' গাইতে গাইতে চলে যায়। *'ঘোড়িয়াঁ' হলো প্রশংসামূলক পঙ্‌ক্তি।* মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ব্যক্তির কথায়ও তিনি (আ.) কখনও রাগ করতেন না বরং তার জন্যও দাঁড়িয়ে যেতেন।

মাস্টার নযীর হোসেন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, যখনই আমি আমার পিতার সাথে কাদিয়ানে হুযূরের কাছে আসতাম এবং হুযূরকে সংবাদ দেওয়া হতো যে, 'হাকীম মারহামে

ঈসা সাহেব এসেছেন’, তখন আমি সবসময় এটিই দেখেছি যে, হুযূর সংবাদ পাওয়ামাত্রই তৎক্ষণাৎ বাইরে আসতেন। আর সেসময় খাওয়ার জন্য কিছু না কিছু পরিবেশন করতেন; আবার কখনও কখনও এমনও হতো যে, তিনি (আ.) নিজেই গিয়ে খাবার নিয়ে আসতেন। তিনি লেখেন, হুযূর এতই সাধারণ এবং সাদামাটাভাবে অতিথিদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন যে, আমি অনেক সময় হুযূরকে এমন অবস্থায় দেখেছি– হুযূরের হাতে কলম থাকত এবং কখনও কখনও হুযূর খালি পায়েই বাইরে আসতেন। ঘরের কামরায় যেভাবে বসে থাকতেন, দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলে ঠিক সেভাবেই বাইরে চলে আসতেন। আর কখনও যদি হুযূর মসজিদে বসা থাকতেন এবং কোনো অতিথি আসত, তাহলে হুযূর অধিকাংশ সময় উঠে দাঁড়িয়ে তার সাথে করমর্দন করতেন। আর যদি হুযূর কারো সাথে অন্য কোনো কথায় মগ্ন থাকতেন এবং এমন সময় কেউ এসে যেত এবং হুযূরের কাছে বসে করমর্দন করতেন, তবে হুযূর তৎক্ষণাৎ তার প্রতি মনোযোগ দিতেন এবং তার অবস্থা ইত্যাদি জিজ্ঞেস করতেন। সারকথা হলো, হুযূর পরম বিনয়ের সাথে তার কাছে আগতদের অভ্যর্থনা জানাতেন।

হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) বলেন, আমার মনে আছে, একবার আমি লাহোর থেকে কাদিয়ানে এসেছিলাম। সম্ভবত এটি ১৮৯৭ বা ৯৮ সালের ঘটনা হবে। হযরত সাহেব আমাকে মসজিদে মুবারকে বসান। তখন এটি ছোটো মসজিদ ছিল। তিনি (আ.) বলেন, ‘বসুন, আমি খাবার নিয়ে আসছি।’ এ কথা বলে তিনি (আ.) ভেতরে চলে যান। আমার ধারণা ছিল, তিনি হয়ত কোনো সেবকের হাতে খাবার পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু কয়েক মিনিট পর যখন জানালা খোলা হয় তখন আমি দেখতে পাই, তিনি (আ.) নিজ হাতেই সিনি অর্থাৎ বড়ো প্লেট বা থালাতে খাবার সাজিয়ে ট্রেতে করে আমার জন্য নিয়ে এসেছেন। আমাকে দেখে তিনি (আ.) বলেন, ‘আপনি খাবার খান, আমি পানি নিয়ে আসছি।’ তিনি (রা.) বলেন, আবেগের আতিশয্যে আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে যে, হযরত সাহেব (আ.) আমাদের ইমাম ও নেতা হওয়া সত্ত্বেও যদি এভাবে আমাদের সেবা করেন, তাহলে আমাদের নিজেদের একে অপরের কত বেশি সেবা করা উচিত?

তাঁর (আ.) সরলতা ও বিনয়ের একটি রেওয়ায়েত হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) ‘মাঈ ভোলী’ (‘মাঈ জীওয়াঁ’) নামক মহিলার বরাতে বর্ণনা করেন। তিনি বর্ণনা করেন, একবার হুযূর (আ.) গ্রামে আগমন করলে আমি নতুন ‘কনক’ অর্থাৎ গম ভেজে নিয়ে যাই। সেই গ্রাম, যেখানে তিনি গিয়েছিলেন। তিনি (আ.) তাঁর সাথে যারা ছিলেন তাদের মাঝে তা বণ্টন করে দেন। নিজেও একটু চেখে দেখেন এবং খুশি হন। আর হুযূর (আ.) যখনই ভ্রমণে আসতেন, তখন আমাদের মাটির মসজিদে এসে ইশরাকের নামায পড়তেন। আমরা শাক-রুটি পরিবেশন করতাম, হুযূর (আ.) কখনও তা খারাপ মনে করেন নি এবং কোনো বিরক্তিও প্রকাশ করেন নি, বরং অত্যন্ত আনন্দের সাথে এই আতিথেয়তা গ্রহণ করতেন।

হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব (রা.) কপুরথলভী একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হযরত সাহেব (আ.) তাঁর বসার জায়গায় কখনো দরজা খোলা রেখে বসতেন না, বরং সবসময় ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে বসতেন। তিনি (রা.) বলেন, হযরত সাহেবযাদা মিয়াঁ মাহমুদ সাহেব একটু পরপর এসে বলতেন, ‘আব্বা, ছিটকিনি খুলুন’ এবং হযরত সাহেব (আ.) উঠে তা খুলে দিতেন। একবার আমি তাঁর সমীপে উপস্থিত হই। তখন হুযূর (আ.) একটি চাটাইয়ের ওপর বসেছিলেন। আমাকে দেখে তিনি (আ.) একটি চৌকি তোলেন এবং ভেতরে নিয়ে যান। আমি বলি, ‘হুযূর, আমি তুলে নিচ্ছি।’ তিনি (আ.) বলেন, ‘এটি অনেক ভারি, আপনি তুলতে পারবেন না।’ এরপর বলেন, ‘আপনি খাটে বসুন।’ *তিনি (আ.) খাটটি*

তুলে সেখানে নিয়ে যান এবং তাকে বসান। আর নিজের সম্পর্কে বলেন, ‘আমার এখানে নীচেই আরাম লাগছে, আমি নীচেই বসব, আপনি খাটে বসুন।’ তিনি বলেন, প্রথমে তো আমি অস্বীকৃতি জানাই, কিন্তু তিনি (আ.) বলেন, ‘আপনি নিঃসংকোচে বসে পড়ুন।’ তারপর আমি বসে পড়ি। আমার তৃষ্ণা পেয়েছিল। আমি কলসিগুলোর দিকে তাকাই, কিন্তু সেখানে পানি পান করার মতো কোনো পাত্র ছিল না। তিনি (আ.) আমাকে দেখে বলেন, ‘আপনার কি তৃষ্ণা পেয়েছে? আমি পানি নিয়ে আসছি।’ এরপর নীচে অন্দরমহল থেকে গিয়ে তিনি (আ.) একটি গ্লাস নিয়ে আসেন। তারপর বলেন, ‘একটু অপেক্ষা করুন।’ তিনি আবার নীচে যান এবং সেখান থেকে শরবতের দুটি বোতল নিয়ে আসেন, যা মনিপুর থেকে কেউ পাঠিয়েছিল। তিনি (রা.) বলেন, শরবত অত্যন্ত সুমিষ্ট ছিল। তিনি (আ.) বলেন, ‘এই বোতলগুলো অনেক দিন ধরে রাখা ছিল, কারণ আমি নিয়্যত করেছিলাম, প্রথমে কোনো বন্ধুকে পান করাবো, তারপর নিজে পান করব। আজ মনে পড়ে গেল।’ অতএব তিনি (আ.) গ্লাসে শরবত বানিয়ে আমাকে দেন। *অর্থাৎ, যে উপহার এসেছিল, সে সম্পর্কে তিনি (আ.) বলছিলেন, ‘প্রথমে আমি কোনো বন্ধুকে পান করাবো, তারপর আমি পান করব।’* তিনি (রা.) বলেন, আমি বললাম, ‘প্রথমে হুযূর এ থেকে সামান্য একটু পান করুন।’ *তাকে যখন গ্লাসে শরবত বানিয়ে দেওয়া হয়, তখন তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেন, ‘প্রথমে আপনি পান করুন, তারপর আমি পান করব।’* তিনি (আ.) এক ঢোক পান করে আমাকে দিয়ে দেন এবং আমি তা পান করি। আমি শরবতের প্রশংসা করি। তিনি (আ.) বলেন, **‘একটি বোতল আপনি নিয়ে যান এবং অন্যটি বাইরে থাকা বন্ধুদের পান করান।’** তিনি (আ.) হয়ত সেই দুই বোতল থেকে ওই একটি ঢোকই পান করেছিলেন। আমি তাঁর (আ.) নির্দেশ অনুযায়ী বোতলগুলো নিয়ে চলে আসি।

একইভাবে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আহমদ জান সাহেবের কন্যা আয়েশা সাহেবা বর্ণনা করেছেন, ১৯০৬ সালে যখন আমার প্রয়াত মাতা ইন্তেকাল করেছিলেন, তখন আম্মা জী অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র স্ত্রী আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যান, নাশতা ইত্যাদি করান। তার চার-পাঁচ দিন পর হযরত উম্মুল মু’মিনীন (রা.) আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসেন। *তিনি ওই জায়গার কথা বলছেন, ওপরে যেখানে রান্নাঘর আছে– সেখানে আম্মাজান তাঁর ঘরে (আমার) মাথা ধুয়ে দিচ্ছিলেন; একজন মহিলা আমার মাথায় পানি ঢালছিলেন এবং আম্মাজান এই মেয়েটির, [যার মা ইন্তেকাল করেছিলেন] মাথা ধুয়ে দিচ্ছিলেন। আর তিনি বলেন,* হযরত উম্মুল মু’মিনীন (রা.) আমার মাথায় সাবান মেখে ধুয়ে দিচ্ছিলেন। ওই মহিলাটি বেশি পানি ঢালছিলেন। হুযূর (আ.) সেখানে পায়চারি করছিলেন। তিনি এটি দেখে ওই মহিলার হাত থেকে বদনাটি নিয়ে আমার মাথায় পানি ঢালতে শুরু করেন। তিনি (আ.) আস্তে আস্তে পানি ঢালতে থাকেন এবং হযরত আম্মাজান অর্থাৎ উম্মুল মু’মিনীন (রা.) চিরুনি দিয়ে (আমার মাথা) আঁচড়াতে থাকেন। হুযূর (আ.) বলছিলেন, ‘এভাবে উকুন চলে যাবে।’ হতে পারে মাথায় উকুনও হয়ে গিয়েছিল, কারণ অনেক দিন ধরে তার মা অসুস্থ ছিলেন, তারপর ইন্তেকাল করেন, যত্ন নেবার মতো কেউ ছিল না। যাহোক, একারণে হয়ত উকুন হয়ে গিয়েছিল অথবা সেসব এলাকায় এমনিতেই উকুন হয়ে যেত। যাহোক, তিনি (আ.) বলেন, **‘এভাবে মাথা ধুয়ে নাও; এভাবে চিরুনি দিয়ে আঁচড়াতে থাকো, তাহলে উকুন চলে যাবে।’**

ঘরের কোনো কাজে সাহায্য করতেও তিনি (আ.) কোনোরূপ দ্বিধাবোধ করতেন না। মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) বলেন, একবার আমি ওযুর জন্য পানির খোঁজে বদনা

হাতে নিয়ে সেই দরজা দিয়ে ভেতরে যাই, যা মসজিদে মুবারক থেকে হযরত সাহেবের বাড়ির ভেতরের দিকে যায়, যেন সেখানে হযরত সাহেবের কোনো সেবককে বদনা দিয়ে ভেতর থেকে পানি আনাতে পারি। ঘটনাক্রমে ভেতর থেকে হযরত সাহেব (আ.) বাইরে আসেন। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলেন, 'আপনার কি পানি দরকার?' আমি নিবেদন করি, 'জি, হুযূর!' হুযূর (আ.) আমার হাত থেকে বদনা নিয়ে নেন এবং বলেন, 'আমি এনে দিচ্ছি।' আর তিনি (আ.) নিজে ভেতর থেকে পানি ভরে নিয়ে আসেন এবং আমাকে দেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, মরহুম ও মগফুর শ্রদ্ধেয় ডা. খলীফা রশীদ উদ্দীন সাহেবের স্ত্রী মুরাদ খাতুন সাহেবা বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রা.) এবং সবাই মিলে আম খান। [আমের মৌসুম ছিল, সেই যুগে চুষে খাওয়ার আম বেশি হতো।] তাই উঠানে (আমের) খোসা ও আঁটির দুই-তিনটি স্তূপ হয়ে যায়। অনেক মহিলা বসে ছিলেন। সেগুলোর ওপর অনেক মাছিও ভন ভন করতে শুরু করে। তারা কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তখন পরিষ্কার করার কথা খেয়াল হয় নি। তিনি বলেন, সেসময় আমিও সেখানে বসে ছিলাম, কয়েকজন খাদেমাও উপস্থিত ছিল, কাজ করার মতো গৃহকর্মী মহিলারাও উপস্থিত ছিল। ইতিমধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আসেন এবং তিনি (আ.) তা দেখতে পেয়ে নিজেই একটি বদনায় ফিনাইল নিয়ে পুরো উঠানে (আমের) খোসার স্তূপগুলোর ওপর নিজের হাতে তা ঢেলে দেন, যেন মাছি ইত্যাদি চলে যায় এবং নোংরা পরিষ্কার হয়, কোনো দুর্গন্ধ না আসে। কাউকে কিছু বলার পরিবর্তে তিনি নিজের কাজের মাধ্যমেই দেখিয়ে দেন যে, ময়লা-আবর্জনা দ্রুত পরিষ্কার করা উচিত। এতে একদিকে যেমন তাঁর (আ.) বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পায়, অন্যদিকে স্বাস্থ্যবিধির প্রতি তাঁর (আ.) মনোযোগও পরিলক্ষিত হয়।

লাহোরের কয়েকজন সম্মানিত ব্যক্তির একটি প্রতিনিধিদল, যাদের মাঝে ড. আল্লামা ইকবাল এবং স্যার শাহাব উদ্দীন প্রমুখও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, হযরত আকদাস (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসেন। এই সাক্ষাতের অবস্থা বর্ণনা করে বাবু গোলাম মুহাম্মদ সাহেব (রা.) বলেন, রাতে খাবার খাওয়ার পর যখন চারপাই (খাট) বণ্টন করা হয়, তখন আমি একটি মজবুত ও বড়ো চারপাই নেই। কিন্তু চৌধুরী শাহাব উদ্দীন সাহেব, যিনি পরবর্তীতে স্যার শাহাব উদ্দীন নামে পরিচিত হন, সেখান থেকে আমার বিছানা সরিয়ে দিয়ে আমার চারপাইটি দখল করেন। (তখন) হযরত সাহেব (আ.) আসেন এবং সবাইকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনাদের কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো?' প্রত্যেকেই বলে, 'হুযূর, আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না।' কিন্তু তিনি (আ.) যখন আমার কাছে আসেন তখন আমি চিন্তিত অবস্থায় দাঁড়িয়েছিলাম, কারণ আমার চারপাইটি চৌধুরী শাহাব উদ্দীন সাহেব দখল করে নিয়েছিলেন। আমি নিবেদন করি, 'হুযূর, আমার চারপাইটি চৌধুরী শাহাব উদ্দীন কেড়ে নিয়েছেন এবং আমি চিন্তায় পড়েছি যে, কোথায় ঘুমাব।' তিনি (আ.) বলেন, 'অপেক্ষা করুন, আমি আপনার জন্য চারপাই নিয়ে আসছি।' তিনি বলেন, এরপর হযরত সাহেব (আ.) চলে যান। অনেকক্ষণ পার হবার পরও যখন চারপাই আসে নি তখন আমি হুযূরের বাড়ির উঠানের দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি মেরে দেখি, এক ব্যক্তি দ্রুত একটি চারপাই বুনছে এবং হুযূর তার কাছে হাতে প্রদীপ নিয়ে বসে আলো দিচ্ছেন। হুযূরের এই অবস্থা দেখে আমি অনেক লজ্জা পাই। আমি এগিয়ে যাই, দরজাও খোলাই ছিল এবং নিবেদন করি, হুযূর! প্রদীপটি আমার হাতে দিন। *এই ল্যাম্পটি আমাকে দিন।* কিন্তু হুযূর (আ.) বলেন, 'এখন তো মাত্র একবার ঘোরানো (বা বুননের কাজ) বাকি আছে।' হুযূরের এই মহান চরিত্র দেখে আমার ওপর এতটা প্রভাব পড়ে

যে, আমার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। সেসময় আমি হুযূরের পবিত্র চেহারার দিকে তাকিয়ে বলছিলাম, **'এই চেহারা কখনও কোনো মিথ্যাবাদীর হতে পারে না!'**

তাঁর (আ.) খাদেম প্রয়াত মির্যা ইসমাঈল বেগ সাহেবের সাক্ষ্য হলো, যখন হযরত আকদাস (আ.) তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার নির্দেশে তাঁর দাবির পূর্বে মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য যেতেন, তখন বাহন হিসেবে একটি ঘোড়াও সাথে থাকত এবং সাধারণত আমিও সঙ্গী হতাম। কিন্তু তিনি (আ.) যখন যাত্রা আরম্ভ করতেন তখন পায়ে হেঁটেই চলতেন এবং আমাকে ঘোড়ায় আরোহণ করিয়ে দিতেন। *যে খাদেম ছিল তাকে ঘোড়ায় বসিয়ে দিতেন, আর নিজে পায়ে হেঁটে যেতেন।* তিনি বলেন, আমি বার বার অস্বীকৃতি জানাতাম এবং নিবেদন করতাম, 'হুযূর, আমার লজ্জা লাগে।' তিনি (আ.) বলতেন, 'আমার পায়ে হেঁটে যেতে লজ্জা লাগে না, তোমার বাহনে চড়তে লজ্জা লাগে কেন?' হযরত (আ.) যখন কাদিয়ান থেকে রওয়ানা হতেন, তখন সবসময় প্রথমে আমাকে বাহনে বসাতেন। যখন অর্ধেকের কম বা বেশি পথ অতিক্রম হয়ে যেত, তখন আমি নেমে যেতাম এবং তিনি (আ.) আরোহণ করতেন। আর একইভাবে যখন আদালত থেকে ফিরে আসতেন, তখনও প্রথমে আমাকে (বাহনে) বসাতেন এবং পরে তিনি (আ.) আরোহণ করতেন। তিনি (আ.) যখন আরোহণ করতেন, তখন ঘোড়া যে গতিতে চলত সে গতিতেই চলতে দিতেন; আমি যেহেতু সাথে সাথে হাঁটছি, আমার যেন কোনো কষ্ট না হয়।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, মৌলভী শের আলী সাহেব (রা.) আমাকে বলেছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যখন মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেবের কাছ থেকে কোনো কথা ইত্যাদি জানার প্রয়োজন পড়ত, তখন তিনি (আ.) তাকে নিজের কাছে ডাকার পরিবর্তে নিজেই মৌলভী সাহেবের কুঠরিতে, ছোট্ট যে কক্ষটি ছিল, সেখানে যেতেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব তাঁর (আ.) বাড়ির একটি অংশে বসবাস করতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর বাড়ির একটি কক্ষ মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেবকে দিয়ে রেখেছিলেন এবং তার কাজ করার দপ্তরটিও সেই ছোট্ট কুঠরিতেই ছিল, যা মসজিদে মুবারকের সাথে পূর্ব দিকে অবস্থিত। সেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেই তার কাছে চলে যেতেন। আক্ষেপের বিষয় হলো, হুযূরের এই বিনয় ও নম্রতা থেকে মৌলভী সাহেবের যে শিক্ষা নেওয়া উচিত ছিল, তা তিনি নেন নি এবং পরিশেষে তার দম্ভই তার কাল হয়েছে।

আল-হাকাম পত্রিকার সম্পাদক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সরলতার বিষয়ে লিখেছেন, তিনি (আ.) যখন ভ্রমণে বের হতেন তখন কেউ যেন সম্মুখে অগ্রসর হয়ে না যায়– এমন কোনো পার্থক্য বজায়ে রাখা হতো না। এমনকি অনেক সময় সাহাবায়ে কেরামের মনে এই আশঙ্কার উদয় হতো যে, রাস্তা থেকে ধুলোবালি উড়ছে আর হযরত সাহেব স্বয়ং সবার পেছনে পড়ে আছেন। হাঁটার ফলে ধুলো উড়বে; কাঁচা পথ ছিল। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কখনো এ বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করতেন না। প্রায়শই এমন হতো যে, পেছন থেকে মানুষের ঢল আসত এবং হুযূরের গায়ে ধাক্কা লাগত, কখনো জুতো খুলে যেত, অর্থাৎ কারো পা লেগে যেত আবার কখনো-বা ধাক্কা লেগে লাঠিটি পড়ে যেত। অথচ কখনো কেউ দেখে নি বা শোনে নি যে, তিনি (আ.) এটি নিয়ে সামান্যতম বিরক্তি প্রকাশ করেছেন কিংবা নিজের জন্য কোনো বিশেষ প্রটোকলের ব্যবস্থা করেছেন। *এটি বলেন নি যে, তোমাদের কি খেয়াল হয় না?* মসজিদে বহুবার এমন হয়েছে যে, তিনি সাহাবীদের মাঝে বসে আছেন, এমন সময়

কোনো নতুন আগন্তুক এসে সরাসরি মওলানা আব্দুল করীম সাহেব কিংবা হযরত হাকীমুল উম্মাহ (তথা হেকীম নূরুদ্দীন)-এর সাথে প্রথমে করমর্দন করত এবং তাদেরকেই মসীহ্ মওউদ মনে করত। তখন সেই বুযুর্গ ব্যক্তিরাই লোকজনকে বলতেন, হযরত সাহেব তো ইনি। সর্বোপরি, তিনি সর্বদা তাঁর নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পবিত্র আদর্শকেই নিজ জীবনের পাথেয় বানিয়েছিলেন এবং সেই অনুপম দৃষ্টান্তই স্থাপন করেছিলেন।

ডাক্তার বাশারত আহমদ সাহেবের একটি বর্ণনা রয়েছে। মালিরকোটলা নিবাসী নওয়াব মুহাম্মদ আলী খান সাহেব-এর স্ত্রীর ইন্তেকাল হলে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) জানাযার সাথে কবরস্থানে যান এবং নিজেই জানাযা পড়ান। তখনো কবর তৈরি ছিল না। আমিও জানাযার সাথে ছিলাম। উপস্থিত লোকজন কবর দেখায় মগ্ন হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমিও সেদিকে মনোযোগী হলাম। কিছুক্ষণ পর তাকিয়ে দেখি, হযরত সাহেব অনুপস্থিত *অর্থাৎ সেখানে নেই*। ঘাবড়ে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতেই দেখি, তিনি বাগানের একপাশে একাকী মাটিতে বসে আছেন। আমি দ্রুত একটি গাছের নীচে একটি সাদা চাদর বিছিয়ে দিই এবং হযরতের কাছে বিনীত নিবেদন করি, এখানে তীব্র রোদ; ওখানে গাছের ছায়ায় চলুন। তিনি বলেন, হ্যাঁ, এটিই ঠিক। তিনি গাছের ছায়ায় সেই চাদরের ওপর গিয়ে বসেন এবং আমিও তাঁর কাছেই বসি। কিছুক্ষণ পর লোকজন যখন দেখল হযরত সাহেব গাছের নীচে বসে আছেন, তখন সবাই সেখানে আসতে শুরু করে। তখন যে-ই আসত, হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বলতেন, 'আসুন, আসুন, এখানে বসুন' আর নিজে পেছনে সরে গিয়ে আগন্তুককে চাদরের ওপর বসাতেন। মানুষ আসতেই থাকে আর হযরত সাহেব নিজে পেছনে সরতে সরতে মানুষকে চাদরের ওপর জায়গা করে দিতে থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যেই আমি দেখলাম, হযরত সাহেব নিজে মাটিতে বসে আছেন আর তাঁর মুরিদরা সবাই চাদরের ওপর বসে আছেন। *আগন্তুকদের তো সাক্ষাতের আবেগে কী হচ্ছে– অর্থাৎ হযরত সাহেব মাটিতে চলে গেছেন আর আমরা চাদরে বসা– তা খেয়াল করার ফুরসত ছিল না, কিন্তু তিনি বলেন*, আমি এ দৃশ্য দেখছিলাম আর মনে মনে ব্যথিত হচ্ছিলাম। একইসাথে আমার ঈমানও প্রগাঢ় হচ্ছিল যে, খোদা যাকে এত উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন, তাঁর অন্তরে কত অসীম বিনয় আর নম্রতা বিরাজমান!

মুনশি জাফর আহমদ সাহেব আব্দুল্লাহ্ আথমের সাথে অমৃতসরে বিতর্ক চলাকালীন সময়ের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সম্ভবত আমরা করীম বখশ নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির কুঠিতে অবস্থান করছিলাম। তখন কর্নেল আলতাফ আলী খান আমাদের সাথে যোগ দেন এবং আমাকে বলেন, তিনি হযরত সাহেবের সাথে নিভৃতে তথা একান্তে দেখা করতে চান। কর্নেল সাহেব কোট-প্যান্ট পরিহিত ছিলেন এবং তার দাড়ি-গোঁফ সম্পূর্ণ কামানো ছিল অ*র্থাৎ ক্লিন শেভ ছিল।* আমি তাকে বললাম, আপনি ভেতরে চলে যান, আমরা বাইরে থেকে কাউকে ভেতরে যেতে দেবো না। তদনুযায়ী কর্নেল সাহেব ভেতরে যান এবং প্রায় আধঘণ্টা হযরত সাহেবের সাথে নিভৃতে কাটান। তিনি যখন কক্ষ থেকে বাইরে এলেন তখন তার চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত ছিল, চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কী কথা হলো যে, এই দশা? তিনি বললেন, আমি যখন ভেতরে গেলাম তখন দেখলাম, হযরত সাহেব আপন ধ্যানে একটি সাধারণ পাটি বা মাদুরের ওপর বসে আছেন; যদিও তাঁর মাত্র একটি হাঁটু পাটির ওপর ছিল আর শরীরের বাকি অংশ ছিল মাটিতে। আমি বিনীতভাবে বললাম, হুযূর! আপনি মাটিতে বসে আছেন? তখন হুযূর সম্ভবত ভাবলেন, কর্নেল সাহেব হয়ত এই সাধারণ পাটিতে বসা পছন্দ করছে না। তাই তিনি নিজের মাথা

থেকে পাগড়ি খুলে মাটিতে বিছিয়ে দিলেন। *সাফা এটিকেও (অর্থাৎ পাগড়িকেও) বলে, আবার কাপড়কেও বলে। অতঃপর বললেন,* হয়ত আপনি মাদুরে বসতে চাচ্ছেন না; ঠিক আছে, তাহলে এখানে কাপড়ের ওপর বসে যান। কর্নেল সাহেব বলেন, এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে আমার চোখে পানি এসে যায়। আমি নিবেদন করলাম, যদিও আমি বিলেতে গিয়ে Baptize হয়েছি অর্থাৎ খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছি, কিন্তু আমি এতটা ঈমানশূন্য নই যে, আপনার পবিত্র পাগড়ির ওপর বসব! হুযূর বললেন, এতে কোনো ক্ষতি নেই, আপনি নিঃসংকোচে বসে যান। অবশেষে আমি সেই পাগড়িটি হাত দিয়ে সরিয়ে মাদুরের ওপর বসলাম এবং নিজের অবস্থা বলা আরম্ভ করলাম যে, আমি প্রচুর মদ পান করি এবং অন্যান্য পাপেও লিপ্ত, আমি খোদা-রসূলের নাম জানি না; কিন্তু আমি এখন আপনার সামনে খ্রিষ্টধর্ম ছেড়ে তওবা করে মুসলমান হচ্ছি। *এ সবকিছু হওয়া সত্ত্বেও আমি খ্রিষ্টান হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু আপনার এ অবস্থা দেখে ও আপনার কথা শুনে আজ আমি খ্রিষ্টধর্ম থেকে তওবা করে মুসলমান হচ্ছি।* তবে আমার যে-সব কুঅভ্যাস হয়ে গিয়েছে, সেগুলো পরিত্যাগ করা আমার জন্য কঠিন মনে হচ্ছে। হুযূর আমাকে বললেন, ইস্তিগফার পাঠ করো এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলো। *মানুষের মাঝে যদি খারাপ অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে যায় এবং ধর্ম থেকে দূরে সরে যায়, সেক্ষেত্রে এটি একটি ব্যবস্থাপত্র যে, ইস্তিগফার পড়ো এবং নামাযের প্রতি মনোনিবেশ করো।* তিনি বলেন, যতক্ষণ আমি হুযূরের কাছে বসে ছিলাম, আমার মনের ভেতর এক তুমুল আলোড়ন চলছিল এবং আমি কেবল কাঁদছিলাম। সে অবস্থাতেই আমি ইস্তিগফার ও নামায পড়ার দৃঢ় অঙ্গীকার করে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বিদায় নিয়েছি। সেই প্রভাব আমার হৃদয়ে এখনও অম্লান। এই কর্নেল সাহেব এ বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন এবং খ্রিষ্টানদের পক্ষে বসতেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তার নেক স্বভাবের কারণে তার মনে প্রভাব সৃষ্টি করেন এবং তিনি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

মৌলভী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি সাহেব বর্ণনা করেন, *এটি সম্ভবত ১৮৯৬ সালের ঘটনা, কারণ ১৯০০ সালে তিনি এই বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন। চার বছর আগের কথা বলছেন যে,* বাড়ির লোকজন তখন লুধিয়ানায় গিয়েছিল। জুন মাস ছিল, আর বাড়িটি তখন নতুন তৈরি হয়েছে। দুপুরের দিকে কক্ষের ভেতর বিছানো একটি খাটিয়ার ওপর আমি শুয়ে পড়লাম। হযরত সাহেব তখন ঘরে পায়চারি করছিলেন। একবার যখন হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙল তখন তাকিয়ে দেখি, হযরত সাহেব মেঝের ওপর আমার খাটিয়ার ঠিক নীচে শুয়ে আছেন! আমি আদবের সাথে ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। তিনি পরম স্নেহের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেন উঠলেন? আমি নিবেদন করলাম, আপনি নীচে শুয়ে আছেন; আমি ওপরে কীভাবে শুয়ে থাকতে পারি? তিনি তখন মৃদু হেসে বললেন, আমি তো আসলে আপনার পাহারা দিচ্ছিলাম। এই ছেলেরা বাইরে শোরগোল করছিল, তাই ওদের বারণ করছিলাম যেন আপনার ঘুমের কোনো ব্যাঘাত না ঘটে।

হযরত মুনশি ইমাম দ্বীন সাহেব নিজের বয়আত গ্রহণের সময়কার দৃশ্য বর্ণনা করে বলেন, আমি ১৮৯৪ সালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত গ্রহণ করি। মাগরিবের নামাযের সময় পর্যন্ত আমার ভাই মুনশি আব্দুল আযীয সাহেব এবং ভাই জামালুদ্দীন সিখোওয়ানি সাহেব আমার সাথেই ছিলেন। নামায শেষ হবার পর মুনশি সাহেব হযরত আকদাসের সমীপে আমার দিকে ইঙ্গিত করে নিবেদন করেন, হুযূর! উনার বয়আত গ্রহণ করুন। হুযূর বলেন, ভেতরে আসুন। আমি যখন একাকী বাইতুল ফিকর-এর ভেতরে

গেলাম, তখন হুযূর ঘরের একটি খাটিয়ার পায়ের অংশে বসলেন আর আমাকে খাটিয়ার মাথার দিকে বসতে ইশারা করলেন। প্রথমে আমি বসতে সংকোচবোধ করি; কিন্তু হুযূর আবার নির্দেশ দিলে আমি বসে পড়ি। তারপর হুযূর আমার বয়আত গ্রহণ করেন। হুযূরের এই আচরণ দেখে আমি এ কথা ভেবে বিস্মিত হয়ে যাই যে, কোথায় সেই সব পীর– যাদের সমান্তরালে কেউ বসতে পারে না, আর কোথায় আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুত মসীহ– যিনি এক তুচ্ছ খাদেমকে খাটিয়ার মাথার দিকে বসান, সম্মানজনক স্থানে বসান! আমার ভাই মুনশি আব্দুল আযীয সাহেব যদিও ঘরের ভেতরে প্রবেশ করেন নি, তবে বাইরে থেকে তিনিও এই দৃশ্য দেখছিলেন।

হযরত মুনশি জাফর আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন, একবার মরহুম মুনশি অরোড়া সাহেব এবং আমি লুধিয়ানায় হুযূরের সমীপে নিবেদন করি, হুযূর! কখনো সযোগ হলে কপুরথলায় আসুন। কপুরথলায় তখনও রেলপথ পৌঁছে নি। হুযূর প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, আমি অবশ্যই সুযোগ হলে আসব। এর কিছুদিন পরই একদিন হুযূর কোনো পূর্ব-সংবাদ না দিয়েই কপুরথলায় চলে আসেন আর ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে, *যে এক্কাগাড়িতে করে এসেছিলেন*, ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে কপুরথলার নিকটে অবস্থিত মসজিদ ফতেহওয়ালী যান। হাফেজ আহমদ আলী সাহেব সঙ্গে ছিলেন। মসজিদ থেকে হুযূর সেখানে যে অআহমদী মৌলভী ছিল তাকে বলেন, 'মুনশি অরোড়া সাহেব অথবা মুনশি জাফর আহমদ সাহেবকে আমাদের আগমনের সংবাদ দিয়ে আসো।' তিনি বলেন, আমি এবং মুনশি অরোড়া সাহেব তখন কাচারিতে ছিলাম। আদালতে কাজ করতেন, শর্টহ্যান্ড লেখক ছিলেন। তখন সেই মৌলভী এসে সংবাদ দেয়, 'মির্যা সাহেব মসজিদে বসে আছেন এবং তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন যেন আমি আপনাদের খবর দিই।' মুনশি অরোড়া সাহেব অত্যন্ত বিস্ময় ও বিরক্তির সুরে পাঞ্জাবী ভাষায় বলেন, মিথ্যা বোলো না! তোমাদের মসজিদে এসে মির্যা সাহেব উঠবেন! যা-ই হোক, দেখিতো একটু গিয়ে? *মুনশি জাফর সাহেব এ কথা বলেন।* এরপর মুনশি সাহেব দ্রুত তার সাফা অর্থাৎ পাগড়ি বেঁধে আমার সঙ্গে রওয়ানা হন। মসজিদে গিয়ে দেখেন, হুযূর মেঝেতে শুয়ে আছেন এবং হাফেয হামিদ আলী সাহেব তাঁর পা টিপে দিচ্ছেন। পাশে একটি পেয়ালা ও একটি চামচ রাখা ছিল। তা দেখে মনে হলো, হয়ত তিনি দুধ পান করেছেন অথবা রুটি ভিজিয়ে খেয়েছেন। এ অবস্থায় মুনশি অরোড়া সাহেব নিবেদন করেন, 'হুযূর, যদি এদিকে আসারই ইচ্ছা ছিল, তবে আমাদের আগে সংবাদ দিতেন! আমরা কর্তারপুর স্টেশনে উপস্থিত হতাম।' হুযূর জবাব দেন, 'সংবাদ দেবার কী প্রয়োজন ছিল? আমি তোমাদের সঙ্গে একটি ওয়াদা করেছিলাম, তা পূরণ করার ছিল, করেছি।' হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'আমার অবস্থা হলো, যদি কারও কোনো কষ্ট হয় আর আমি নামাযে মশগুল থাকি, আর তার আওয়াজ আমার কানে পৌঁছে, তাহলে আমার ইচ্ছা হয়– নামায ভেঙেও যদি তার কোনো উপকার করতে পারি, তবে তার উপকার করি আর যতদূর সম্ভব তার প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করি। এটি নৈতিকতার পরিপন্থি যে, কোনো ভাই বিপদ ও কষ্টে পড়লে তাকে সহযোগিতা করা হবে না। তোমরা যদি তার জন্য আর কিছুই করতে না পারো, তবে অন্তত তার জন্য দোয়া করো। আপনজনদের কথা তো বাদই দিলাম, আমি তো বলি যে, পর ও হিন্দুদের সঙ্গেও উত্তম নৈতিকতার নমুনা প্রদর্শন করো এবং তাদের প্রতি সহমর্মিতা দেখাও। কখনোই উদাসীন স্বভাবের হওয়া উচিত নয়।' *এটি শুধু উপদেশই নয়; বরং আপনাদের সামনে যে ঘটনাগুলো বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো থেকেই বোঝা যায় যে, স্বয়ং তাঁর কর্মপদ্ধতিও এমনই ছিল।* হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লেখেন, 'একদা আমি

বাইরে হাঁটতে যাচ্ছিলাম। আমার সঙ্গে আব্দুল করিম সাহেব নামক একজন পাটোয়ারি ছিলেন। তিনি কিছুটা সামনে ছিলেন আর আমি পেছনে। পথে এক বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে দেখা হলো। তার বয়স সত্তর বা পঁচাত্তর বছরের মতো হবে। তিনি সেই পাটোয়ারির কাছে একটি চিঠি পড়ে শোনানোর অনুরোধ করলেন। কিন্তু সে তাকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দিল।'

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'এতে আমি অনেক কষ্ট পাই। পরে আমি তার কাছে গেলাম, তখন সে আমাকে সেই চিঠিটি দিল। আমি তা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং চিঠিটি পড়ে তার অর্থ ভালোভাবে তাকে বুঝিয়ে দিলাম। এতে পাটোয়ারি খুব লজ্জিত হলো; কারণ সেই তো তাকে দাঁড়াতেই হলো, আবার পুণ্য থেকেও বঞ্চিত হলো। *সে যদি বিনয়ের সঙ্গে চিঠিটি পড়ে শোনাতো তাহলে সেটাই উত্তম হতো।*

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন, খাকসার নিবেদন করছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন হাস্যবদনে সাক্ষাৎ করতেন; তাঁর সঙ্গে দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গেই সাক্ষাৎকারীর সব দুঃখ-কষ্ট যেন দূর হয়ে যেত *তাঁর হাসিমাখা মুখ দেখে।* প্রত্যেক আহমদী অনুভব করত যে, তাঁর সান্নিধ্যে গেলে হৃদয়ের সমস্ত দুঃখ ও বিষণ্নতা ধুয়ে-মুছে যায়। তাঁর হাস্যোজ্জ্বল চেহারার দিকে একবার দৃষ্টি পড়লেই সমস্ত শরীরে যেন আনন্দের এক স্রোত বয়ে যায়। তাঁর অভ্যাস ছিল– তিনি কোনো নগণ্য বা অতি সাধারণ ব্যক্তির কথাও অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে উত্তর দিতেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই এটি মনে করত যে, হযরত সাহেব আমাকেই সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। অনেক সাধারণ মানুষ, যারা নবী-রসূলগণের মজলিসের আদব-কায়দা সম্পর্কে অবগত নয়, তারা দীর্ঘ সময় ধরে নিজেদের অপ্রাসঙ্গিক গল্প-কাহিনি বলতে থাকত আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নীরবে সেগুলো শুনে যেতেন; কখনো কাউকে এ কথা বলতেন না– 'এখন যথেষ্ট হয়েছে, কথা বন্ধ করো'।

একবার একজন ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে মাথা নীচু করে তাঁর পায়ের ওপর নিজ মাথা স্পর্শ করতে চাইল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ হাতে তার মাথা সরিয়ে দিয়ে বলেন, 'এ পদ্ধতি বৈধ নয়; বরং আসসালামু আলাইকুম বলা এবং করমর্দন করা উচিত।'

হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) লিখেছেন, কাশ্মীরের একজন দীর্ঘকায় দরিদ্র আহমদী ব্যক্তি ছিলেন; তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে নিজের গ্রাম থেকে কাদিয়ান পর্যন্ত পুরো পথ হেঁটে আসতেন। তার নাম ছিল সম্ভবত আকালজু। একবার তিনি কাদিয়ানে আসেন, সেই সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক সকালে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাইরে বের হন। চৌরাস্তায় সেই কাশ্মীরিও দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি হযরত সাহেব [তথা মসীহ্ মওউদ (আ.)]-কে দেখামাত্র ভালোবাসার আতিশয্যে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পায়ের ওপর মাথা রেখে দেন। তিনি (আ.) ঝুঁকে তাকে উঠিয়ে দেন এবং বলেন, 'এটি অবৈধ; মানুষকে সিজদা করা উচিত নয়।' *অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির সামনে কখনো সিজদা করা উচিত নয় এবং কারও পায়ের কাছে নত হওয়াও উচিত নয়।*

অনুরূপভাবে হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি সাহেব (রা.) লিখেছেন, একদা এক ব্যক্তি যে জাগতিক পীর-ফকিরের ভক্ত ছিল, তথা তাদের প্রেমিক ছিল, তাদের প্রতি মুগ্ধ ছিল; পীর-ফকীরদের আসরে বসায় অভ্যস্ত ছিল। [মৌলভী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি সাহেব (রা.)] বলেন, একদা সে আমাদের মসজিদে আসে, লোকদেরকে অত্যন্ত স্বাধীনভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে কথা বলতে দেখে বিস্মিত হয়ে যায়। সে

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলে, ‘আপনাদের মসজিদে তো কোনো আদব-শৃঙ্খলা নেই! *সেই ব্যক্তি যে পীর-ফকীরদের আসর থেকে উঠে এসেছিল, সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলল,* ‘আপনাদের মসজিদে তো কোনো আদব-শৃঙ্খলা নেই! লোকেরা খোলামেলা এবং নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় আপনার সামনে বসে আছে এবং আপনার সঙ্গে অবাধে কথা বলছে; আপনার যথাযথ সম্মান করছে না!’ এর উত্তরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, ‘আমার নীতি এমন নয় যে, আমি রুক্ষ স্বভাবের ও ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে এমনভাবে বসে থাকব, যেন লোকেরা আমাকে বন্য জন্তুর মতো ভয় করে। আর আমি মূর্তি সাজাকে অত্যন্ত অপছন্দ করি। আমি তো মূর্তিপূজা দূর করতে এসেছি; নিজে মূর্তি হয়ে বসতে নয়, যার ফলে মানুষ আমার পূজা করতে শুরু করে। আল্লাহ্ তা’লা ভালো জানেন, আমি নিজের সত্তাকে অন্য কারও ওপর সামান্যও প্রাধান্য দেই না। আমার দৃষ্টিতে অহংকারী ব্যক্তির চেয়ে বড়ো মূর্তিপূজারী ও নিকৃষ্ট আর কেউ নেই। অহংকারী ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে না; বরং নিজেরই উপাসনা করে।’

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) হযরত মুনশি জাফর আহমদ সাহেবের (রা.) একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন; তিনি (রা.) বলেন,

একদা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দিল্লী থেকে ফেরত আসার সময় অমৃতসর যাত্রাবিরতি দেন। হযরত উম্মুল মু’মিনীনও সহযাত্রী ছিলেন। হুযূর (আ.) একজন পুত্রকে *যিনি সম্ভবত মিঞাঁ বশীর আহমদ সাহেব ছিলেন*, কোলে নেন এবং একটি ভারি ব্যাগ অপর বগলে নেন। *অর্থাৎ, একহাতে বাচ্চা উঠিয়েছেন আর অপর হাতে ব্যাগ।* আমাকে তিনি বলেন, আপনি পানদান (পান রাখার পাত্র) নিয়ে নিন। তিনি (তথা হযরত মুনশি জাফর আহমদ) সাথে ছিলেন, তাকে বলেন, ছোটো পানদান রয়েছে; সেটি আপনি বহন করুন। আমি বলি, আমাকে ব্যাগটি দিয়ে দিন। তিনি অস্বীকৃতি জানান। আমার এক-দুবার বলার পর হুযূর (আ.) একই উত্তর দেন। অগত্যা আমি পানদান তুলে নিই আর আমরা চলতে শুরু করি। এরই মাঝে দু-তিনজন যুবক বয়সের ইংরেজ– যারা স্টেশনে ছিল– আমাকে বলে, হুযূরকে দাঁড়াতে বলুন। আমি নিবেদন করি, হুযূর! এরা চাচ্ছেন হুযূর যেন একটু থামেন। হুযূর দাঁড়িয়ে যান, সেই ইংরেজরা স্টেশনেই ছিল। তারা এই অবস্থাতেই হুযূরের ছবি তুলে নেয়– একহাতে (হুযূর) বাচ্চা ধরে রেখেছেন আর অপরহাতে মালপত্র বহন করছেন। *তারা ছবি তুলতে চাচ্ছিল। তাঁর এতটা সরলতা সত্ত্বেও তারা তাঁর ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং তারা বলে, আমরা এই বুযুর্গের ছবি তুলতে চাই।*

হযরত মালিক মওলা বখশ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, অমৃতসরে মিঞাঁ জান মুহাম্মদ নামের এক ব্যক্তি আমার ঘরের সামনে থাকতেন। তিনি বাচাল প্রকৃতির ছিলেন। হযরত আকদাস (আ.)-এর পুস্তক ‘সুরমায়ে চশমায়ে আরিয়া’-র কার্যতই হাফেয ছিলেন। নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও আর্যদের সাথে অনেক বিতর্ক করতেন। তিনি মানসিক রোগে আক্রান্ত হন। বিষণ্ণতা (ডিপ্রেসন) ও উন্মাদনার অবস্থা হয়ে যেত। যার সাথেই সাক্ষাৎ হতো, তাকেই দীর্ঘক্ষণ দাঁড় করিয়ে নিজের অসুস্থতার বিবরণ সবিস্তারে শোনাতেন। লোকেরা তার কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে যেত। (একসময়) লোকেরা তার কথা শোনা এড়িয়ে যেতে শুরু করে। একজন তাকে পরামর্শ দেয়, তুমি কাদিয়ান গিয়ে হযরত হেকীম মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবের কাছে চিকিৎসা করাও। তিনি বলেন, তিনি তো অনেক বড়ো ব্যক্তিত্ব; আমার ঘটনা শোনার তার সময় কোথায়? *তিনি বলেন, হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) আমার বিস্তারিত ঘটনা আদৌ শুনবেন না।* সে ব্যক্তি বলে, এমনটি নয়, তিনি খুবই উন্নত চরিত্রের অধিকারী

ব্যক্তি; তিনি অবশ্যই তোমার কথা শুনবেন। অতএব তিনি কাদিয়ান চলে আসেন। কাকতালীয়ভাবে যখন তিনি ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামেন ঠিক সেই সময় হযরত আকদাস (আ.) সাহাবীদের সাথে ভ্রমণ থেকে ফেরত আসছিলেন। ঘোড়ার গাড়ির চালক বলে, এই যে হযরত মির্যা সাহেব আসছেন। আর কী চাই! সেই ব্যক্তি ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে সোজা গিয়ে করমর্দন করেন এবং নিজের অসুস্থতার বিস্তারিত বিবরণ শোনাতে শুরু করেন। *অস্থির হয়ে যেভাবে বর্ণনা করতেন, দীর্ঘ কাহিনী শোনাতে শুরু করেন।* ঘটনাগুলো এত দীর্ঘ হলো যে, সবাই বিরক্ত হয়ে গেল, কিন্তু হযরত আকদাস (আ.) নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে তার হাতে হাত রেখে সব শুনতে থাকেন। পরিশেষে মিঞাঁ জান মুহাম্মদ সাহেব নিজেই বলেন, *অর্থাৎ সেই অসুস্থ ব্যক্তি বলেন,* এখন আমার মুখ শুকিয়ে গেছে, আমি আর কথা বলতে পারছি না। আমি এতক্ষণ বলেছি আর আপনি শুনেই যাচ্ছেন। এতে হুযূর (আ.) বলেন, ভালো কথা; আপনি অতিথিশালায় যান, কিছু পানাহার করুন, অতঃপর মৌলভী সাহেব *অর্থাৎ, হযরত হেকীম মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবের (রা.)* কাছে নিজের অবস্থা শুনিয়ে তাঁর থেকে ঔষধ নিয়ে নিন।

তিনি চাঙ্গা হয়ে মৌলভী সাহেবের সমীপে উপস্থিত হন; *অর্থাৎ হযরত হেকীম নূরুদ্দীন সাহেবের সমীপে;* আর সেই বিস্তারিত ঘটনাবলি শোনাতে শুরু করেন। হযরত মৌলভী সাহেব দ্রুত ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন। *সামান্যই বর্ণনা করেছিলেন; তিনি (রা.) যেহেতু হেকীম ছিলেন, তাই রোগটা বুঝতে পারলেন। ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন* আর বলেন, আমি আপনার রোগ বুঝতে পেরেছি, বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। তিনি ব্যবস্থাপত্র তো নিয়ে নেন কিন্তু বলতে থাকেন, বলা হয় মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবের চরিত্র অনেক উন্নত; কিন্তু হযরত মির্যা সাহেবের ব্যবহারের সাথে তার কী তুলনা! তিনি পূর্বে বয়আত করেন নি, কিন্তু তার হৃদয়ে এই বিষয়টি এতটাই প্রভাব বিস্তার করে যে, তিনি বয়আত করে নেন।। তিনি বলেন, এই ঘটনা তার উপস্থিতিতে আমাকে মরহুম ডাক্তার ইবাদুল্লাহ্ সাহেব শুনিয়েছেন, আর তিনি (তথা জান মুহাম্মদ) এর সত্যায়ন করেছেন।

একইভাবে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন, মাস্টার আল্লাহ্ দিত্তা সাহেব লিখিত বিবৃতি দিয়েছেন যে, একবার লাহোরে আহমদীয়া বিল্ডিংয়ে হুযূর (আ.) অবস্থান করছিলেন; শারকপুর ভিনি থেকে মুস্তাকিম নামের একজন দুর্বল, ভগ্ন স্বাস্থ্যের ব্যক্তি হুযূর (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসেন। মানুষের ভিড়ে হুযূর (আ.)-এর কাছে পৌঁছাতে না পেরে তিনি উঁচু স্বরে বলেন, হুযূর! আমি তো সাক্ষাতের জন্য এসেছি। হুযূর (আ.) বলেন, বাবাজি-কে সামনে আসতে দাও। বৃদ্ধ মানুষ ছিলেন, দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল; এ কারণে হুযূর (আ.) বলেন, বাবাজি-কে কষ্ট দিও না। তারপর হুযূর (আ.) স্বয়ং উঠে তার কাছে গিয়ে বসেন।

একইভাবে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন; হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন কয়েকজন সাহাবী সহ বাবা সাহেবের চোলা দেখার জন্য ডেরা বাবা নানকে যান, তখন সেখানে একটি বটগাছের নীচে কিছু কাপড় বিছিয়ে জামা'তের সদস্যদের সাথে হুযূর (আ.) বসে পড়েন। মৌলভী মুহাম্মদ আহসান সাহেবও (রা.) সাথে ছিলেন। গ্রামের মানুষ হুযূর (আ.)-এর আগমনের সংবাদ শুনে সেখানে একত্রিত হতে আরম্ভ করে। তখন তাদের মধ্য থেকে কিছু মানুষ যারা প্রথমে এসেছিল, মৌলভী মুহাম্মদ আহসান সাহেবকে মসীহ্ মওউদ (আ.) মনে করে তার সাথে করমর্দন করে বসে যেতে থাকে। তিন-চারজন মানুষ করমর্দন করার পর তারা বুঝতে

পারল যে তারা ভুল করেছে। এরপর মৌলভী মুহাম্মদ আহসান সাহেব (রা.) প্রত্যেক এমন ব্যক্তি– যারা তার সাথে করমর্দন করত– তিনি হুযূর (আ.)-এর দিকে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিতেন, ইনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)।

হযরত শেখ আব্দুল কাদের সাহেব লেখেন, তাঁর (আ.) বড়ো ছেলে হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব মরহুম বলতেন, আমার পিতা যদিও সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশের সন্তান ছিলেন, মোগল ছিলেন, কিন্তু নিজের জীবন একজন মোগলের মতো অতিবাহিত করেন নি, বরং ফকিরের মত জীবন অতিবাহিত করেছেন। কাদিয়ানের কানাইয়্যা লাল সাররাফ-এর বর্ণনা:

একবার হযরত মির্যা সাহেবকে বাটালা যেতে হয়। তিনি আমাকে বলেন, ঘোড়ার গাড়ি ডেকে দাও। হযরত সাহেব যখন নদীর তীরে পৌঁছেন তখন তাঁর স্মরণ হয়, কোনো কিছু ঘরে ফেলে এসেছেন। ঘোড়ার গাড়ি চালককে সেখানেই রেখে তিনি স্বয়ং হেঁটে ফেরত চলে আসেন। ঘোড়ার গাড়ির চালক পুলে অন্য যাত্রী পেয়ে গেলে সে বাটালা চলে যায় আর মির্যা সাহেব সম্ভবত হেঁটেই বাটালা চলে যান। আমি ঘোড়ার গাড়ির চালককে ডেকে এনে মারধর করি আর বলি, হতভাগা! যদি মির্যা নিযাম উদ্দীন হতো আর তোকে তিনদিন সেখানে বসে থাকতে হতো তবে বসে থাকতি; কিন্তু যেহেতু ইনি নেক ও দরবেশ স্বভাবের মানুষ, এই জন্য তুই তাঁকে ছেড়ে চলে এসেছিস? তিনি বলেন, যাহোক, যখন মির্যা সাহেব অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই সর্ম্পকে জানতে পারেন তখন তিনি আমাকে ডেকে এনে বলেন, সে আমার জন্য কেন বসে থাকত? সে যাত্রী পেয়েছে তাই চলে গেছে। তুমি কেন তাকে মারধর করেছ?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত তাহাজ্জুদে ওঠার চেষ্টা করা, আর পাঁচ বেলার নামাযেও কুনুত পড়া বা দীর্ঘ দোয়া করা, আল্লাহ্ তা'লাকে অসন্তুষ্ট করে এমন প্রতিটি বিষয় থেকে তওবা করা। তওবা করার অর্থ হচ্ছে সেই সমস্ত খারাপ কাজ এবং আল্লাহ্ তা'লাকে অসন্তুষ্ট করার কারণ হয় এমন বিষয়সমূহকে পরিত্যাগ করে সত্যিকার অর্থে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করা ও সামনে এগিয়ে যাওয়া এবং তাকওয়া অবলম্বন করা, চারিত্রিক সংশোধন করা। এর ফলেও আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভ হয়। মানবীয় অভ্যাসগুলো সংশোধন ও সুন্দর করা উচিত। ক্রোধ যেন না থাকে, বিনয় ও বিনম্রতা এর স্থান নেয়। চরিত্রের সংশোধনের পাশাপাশি নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সদকা-খয়রাত করা উচিত। তিনি (আ.) জামা'তকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেছেন।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, মুত্তাকীদের জন্য শর্ত হলো, তারা যেন দীনহীন ব্যক্তির ন্যায় বিনয় ও অনাড়ম্বরতার মাঝে জীবন অতিবাহিত করে। এটি তাকওয়ার একটি শাখা যার মাধ্যমে আমাদেরকে অন্যায় ক্রোধের মোকাবেলা করতে হবে। উচ্চ পর্যায়ের তত্ত্বজ্ঞানী এবং সিদ্দিকগণের জন্য চূড়ান্ত ও কঠিনতম স্তর হলো ক্রোধ এড়িয়ে চলা। আত্মঅহমিকা ও গর্ব ক্রোধ থেকে জন্মায়, আর একইভাবে ক্রোধ নিজেও আত্মঅহমিকা ও গর্বের ফল হয়ে থাকে। কারণ ক্রোধ সেই সময়েই হৃদয়ে দানা বাঁধে যখন মানুষ নিজেকে অন্যের ওপর প্রাধান্য দেয়। আমি চাই না আমার জামা'তের সদস্যরা পরস্পর একে অপরকে ছোটো বা বড়ো মনে করবে, অথবা একে অন্যের ওপর গর্ব করবে বা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখবে। খোদা জানেন– কে বড়ো আর কে ছোটো। এটি এক ধরনের অবজ্ঞা এবং যার মাঝে অবজ্ঞা রয়েছে, সমূহ শঙ্কা রয়েছে– এই অবজ্ঞা বীজের মতো অঙ্কুরিত হয়ে তার ধ্বংস ডেকে আনবে। কতিপয় ব্যক্তি সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে দেখা করে অত্যন্ত সম্মানসূচক আচরণ

করে। কিন্তু সম্মানিত সে– যে দরিদ্রের কথা বিনয়ের সাথে শোনে, তার মনস্তুষ্টি করে, তার কথার সম্মান করে, মুখে এমন কোনো অসম্মানজনক কথা উচ্চারণ করে না যা তাকে কষ্ট দেয়। মহান আল্লাহ্ বলেন-

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [সূরা হুজুরাত:১২]

অর্থাৎ, নাম বিকৃত করে তোমরা একে অন্যকে ডেকো না। ঈমান আনার পর এমন অবাধ্যতা করা অনেক বড়ো পাপ। এটি থেকে যারা তওবা করে না– তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।

এর বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, পরস্পরকে ক্ষেপানোর উদ্দেশ্যে বিকৃত নামে ডেকো না, বিকৃত নাম রেখো না। এ কাজটি দুষ্কৃতকারী ও পাপাচারীর কাজ। যে ব্যক্তি কারো উপহাসমূলক নাম রাখে, সে নিজে অনুরূপ কষ্টের সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। নিজের ভাইদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান কোরো না। সবাই যেহেতু একই প্রস্রবণ থেকে পানি পান করো, তাহলে কে জানে– কার ভাগ্যে বেশি পানি পান করা নির্ধারিত আছে? পার্থিব নীতিমালায় কেউ সম্মানিত এবং মর্যাদাবান হতে পারে না। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মহান সে– যে মুত্তাকী।

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [সূরা হুজুরাত:১৪]

অর্থাৎ, তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত, যে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সকল বিষয়ে অবহিত।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রকৃত অর্থে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনের সামর্থ্য দান করুন, আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আত গ্রহণের পর আমরা যেন প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার ওপর আমল করতে পারি ও প্রকৃত অর্থে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারি। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)